(১)

ভক্ত বাবা সম্বন্ধে অজানা কিছু কথা

শ্রী শংকর চক্রবর্তী

শ্রী শ্রী বিমলানন্দজী মহারাজ যিনি ভক্ত বাবা নামে সকলের কাছে পরিচিত। কলকাতার মনোহর পুকুরে সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ধার্মিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ছিলেন যমজ ভাই এর মধ্যে সামান্য সময়ের বড়। বাবা ছিলেন স্থপতি, বড়দা ব্যারিস্টার। তাঁর ৯ বছর বয়সে উপনয়ন হয়। ১০ বছর বয়সে বাবা মায়ের সঙ্গে তারও দীক্ষা ও সন্যাস লাভ হয় এক সাধকের সৌজন্যে। কিন্তু সেই সাধক তাঁর উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেননি। যথারীতি স্কুল কলেজে পড়াশুনা করেছেন। তাঁদের শ্যামবাজারেও একটা বাড়ী ছিল। একদিন দুপুর বেলা শ্যামবাজারের বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরিয়েছেন তখন তাঁর বয়স ১১ বছর, বামাক্ষ্যাপা চলেছেন রাস্তা দিয়ে কালিঘাটের দিকে, ভক্ত বাবা তাঁর পিছু নিয়েছেন। তিনি ভক্ত বাবা পিছু পিছু আসছেন দেখে থমকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভক্ত বাবা কে বাড়ী যেতে বলেছেন কিন্তু পিছনে যাওয়া বন্ধ করেননি এইভাবে কালিঘাট মন্দির পারহয়ে শ্মশানের কাছে ফাঁকা জায়গায় গেলে ভক্তবাবাকে ডেকে সস্নেহে পাশে বসিয়ে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই অল্প বয়সে সাধারন পোষাকে বামাক্ষ্যাপা চলেছেন আপনি কিভাবে চিনলেন ? ভক্ত বাবা বললেন, "আমি ওঁকে দেখে ভেতর থেকে একটা প্রেরনা পাচ্ছিলাম যে ওঁর থেকে কিছু পাব"। ঐ অল্প বয়স থেকেই চলেছে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গ। ছাত্র জীবনেই কাশী গিয়ে বাবাজী মহারাজের দর্শন পান। এই ভগবৎ স্বরূপ অতি প্রাচীন মহাপুরুষই ভক্তবাবার সাধন জীবনের নির্দেশক ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। বাবাজী মহারাজের সমসাময়িক এক মাতাজীর কথাও বহুবার বলেছেন। ভক্তবাবাকে ভীষন স্নেহ করতেন, কিন্তু তাঁর নাম কোন দিন আমার জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তিনি কোথায় থাকেন? বাবাজী মহারাজের কাছ থেকেই গোলকাধিপতি পরমপিতা জয়রাধে গোবিন্দর সাধনার নির্দেশ পান এবং হিমালয়ে গিয়ে প্রথমে শৈবের সাধনা করেন। ভক্তবাবা কিন্তু পড়াশুনা চালিয়ে যান এত সাধুসঙ্গ পাওয়া সত্ত্বেও। এখানকার পড়াশুনা শেষ করে বিদেশ যান উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য। আমেরিকা থেকে ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউট। পরে জার্মানিতে শেষে আবার আমেরিকায় পড়াশুনা করেন। তিনি কেমিস্ট ছিলেন, ১২ বছর আমেরিকায় থেকে কাজ করেন। সেই সময় প্রেততাত্ত্বিক অভেদানন্দজীর সঙ্গে পরিচয় হয়। অভেদানন্দজী তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য ভক্ত বাবাকে বহুবার বলেছেন কিন্তু তিনি যাননি। মায়ের অসুখ হওয়ায় মা কে দেখতে ভারতে আসেন। মা সুস্থ হওয়ার পর আর বিদেশে যেতে দেননি। বিদেশে থাকাকালীন যে টাকা পাঠাতেন মা সেই টাকা পাশ বইয়ে জমিয়ে রেখেছেন। টাকার পরিমান বিশাল অঙ্কে পরিনত হয়েছে। ভক্ত বাবার মা সেই টাকা দিয়ে যে বিশয়ে পড়াশুনা করেছেন সেই বিষয়েই ব্যবসা করতে বলেন। এক ভগ্নিপতিকে সঙ্গী করে একটা ল্যাব তৈরী করে উৎপাদন শুরু করেন। ব্যবসার সাফল্যে প্রচুর টাকা আসতে লাগল। মা বাবা বহুবার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন কিন্তু রাজী হননি। একটা মজার ব্যাপার ছিল ভক্তবাবার অসুখ করলে যমজ ভাই ও অসুস্থ হত। আবার যমজ ভাই অসুস্থ হলে ভক্তবাবা অসুস্থ হতেন। যমজ ভাই হঠাৎ মারা যাওয়াতে মা আর বিয়ের কথা বলেননি। ভেবেছিলেন ভক্তবাবাও আর বাঁচবেন না। ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে, ভক্তবাবার হঠাৎ নজরে পড়ল ভগ্নিপতি অবৈধ ভাবে ব্যবসা থেকে টাকা সরাচ্ছেন। তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যবসা আর করবেন না, সবছেড়ে হিমালয় চলেগেলেন। সন্ন্যাস তো আগেই নেওয়া ছিল, গুহায় থাকার প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কুলির মাথায় দিয়ে চলেছেন, একটা খাদ কুলী লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল ভক্তবাবা সাহস পেলেন না তাই নীচে নেমে ওপরে যখন উঠলেন কুলী মালপত্র নিয়ে সরে গেছে, ফিরবেন না তাই এগিয়ে চলেছেন। সন্ধ্যা হয়েগেছে, অন্ধকার হয়েছে, ঠিক করতে পারছেন না কি করবেন ? কোন দিকে যাবেন ? এমন সময় দূরে বনের মধ্যে কোথাও আগুন জ্বলছে তার শিখা দেখতে পেলেন। সেটা লক্ষ্যকরে গিয়ে দেখলেন একটা চালাঘরে ধুনী জ্বলছে, একপাশে একবাবা অন্য পাশে মা বসে ধ্যানস্থ। বাবার পিছনে গিয়ে হাত জোড় করে বসে আছেন, বহুক্ষন পর বাবা চোখ খুললেন এবং ভক্তবাবার কাছে সব শুনে বললেন, "তোমার তো ভুখ লেগেছে, বস আমি খাবার নিয়ে আসছি।" প্রায় ঘন্টাখানেক পর গরম গরম পুরী, সবজি,লাড্ডু নিয়ে ফিরলেন। খাওয়ার পর কোন দিকে যেতে হবে কতটা গেলে একটা বস্তি পাবে, সেখানে এই নামে আমার ভক্ত আছে তাকে আমার কথা বললেই সে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিয়ে দেবে, তার পর কোথায় গুহা নেবেন সমস্ত নির্দশ ভক্ত বাবাকে দিয়ে আবার ধ্যানস্থ হলেন। ভক্তবাবা বসে আছেন এমন সময় একটা সাপ এসে পায়ের কড়ে আঙ্গুলে কামড়ে দেয়। আঙ্গুল চেপে আছেন কষ্ট হচ্ছে মুখে কিছু বলছেন না পাছে ওঁদের ধ্যানের বিঘ্ন ঘটে।

খানিক বাদে আবার বাবা ধ্যানভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে ? ভক্তবাবা বললেন, "বাবা কীড়া কাট দিয়া", অদূরে একটা ফাটলে সাপটা ঢুকে গেছে, লেজটা দেখা যাচ্ছে। ভক্তবাবাকে বললেন "তুমি দাঁত দিয়ে লেজের শেষটা কেটে দাও।" ভক্তবাবা লেজে কামড় দিয়ে এসে আবার বসলেন। বাবাও ধ্যানস্থ হলেন, আর খেয়াল নেই। পরের দিন সকালে গায়ে উপর থেকে টপটপ শিশির পড়ছে, ঘুম ভেঙ্গে দেখছেন গাছের তলায় শুয়ে আছেন।

পরের পৃষ্ঠায়

সেই চালাঘর ধুনি, মা, বাবা কেউই নেই। উঠে আবার নির্দ্দেশমত সেই লোকের সন্ধান করে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে গুহায় প্রবেশকরে সাধন শুরু করেন। এর কিছুদিন পর হঠাৎ উপরের গুহা থেকে অভেদানন্দজী মহারাজ ভক্তবাবাকে ডাকছেন। অভেদানন্দজী থেকে প্রেত বিষয়ে বহু কিছু জানলেন। হিমালয়ের গুহায় থাকাকালীন খোঁজ পেয়েছিলেন কোন এক জায়গায় নরখাদক মানুষ পরিবার আছে। স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে মেয়ে সবাই উলঙ্গ। যারা জড়ি-বুটি রুদ্রাক্ষ সংগ্রহ করে পাহাড়ে এমন দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের দেখতে গিয়ে বিপদে পড়েন। দুজনকে ওরা বেঁধে ফেলে দেখে ভক্তবাবা কোনমতে পালিয়ে আসেন। পরে বাবা জী মহারাজ শুনে ভক্তবাবাকে বলেছিলেন, "গুরুর কৃপায় তুমি বেঁচে গেছ। আমাকে জানিয়ে গেলে এই বিপদ হতনা।" শঙ্খ চক্রধারী জয় রাধে গোবিন্দর দর্শন পেয়ে সাধনা সমাপ্ত করে ফিরে আসেন কলকাতায়। তার কয়েক বছর পর হরিদ্বার গিয়ে তারা ক্ষ্যাপার শিষ্য হরি ক্ষ্যাপার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি ভক্তবাবাকে পুরুলিয়ার দেউলঘাটায় নিয়ে আসেন। এখানে থাকাকালীন তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। নবরাত্রিতে ৯ দিন ব্যাপি জয় রাধে গোবিন্দ নামযজ্ঞ করেন। কয়েক বছর থাকার পর বাঘমুন্ডির অসুস্থ রাজা তাঁর কৃপায় সুস্থ হলে পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের ধারে একটা প্রাচীন বটগাছ সংলগ্ন কিছু জমি দেন, সেখানে প্রথমে কুঠিয়া করে থাকেন। তারপর পুরুলিয়া শহরের উপকন্ঠে রাঁচী রোড, মাগুড়িয়ায় এক শুভানুধ্যায়ী জমিদান করেন। সেখানে বদরী আশ্রম স্থাপন করে জয় রাধে গোবিন্দের পূজা শুরু হয়। এরপর বাবাজী মহারাজ ভক্তবাবার সঙ্গে তাঁর এক সুযোগ্য শিষ্য কামরাজ বাবার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, "এই বাবার কাছ থেকে তুমি পরবর্তী সব কিছু পাবে।" কামরাজ বাবার কাছ থেকে শাক্ত, শৈব ও তন্ত্রের শিক্ষা নেন। কামরাজ বাবা পায়ে হেঁটে কৈলাসে নিয়ে গিয়ে মহাদেব দর্শন করান যা অতি দুর্লভ। কুবেরের ধনাগারে নিয়ে যান। হিমালয়ের আরও অনেক কিছু দর্শন করান। এরপর নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হয়েও বদরী আশ্রমে কল্যানেশ্বরী মায়ের পূজা বৈষ্ণবমতে শুরু করেন এবং মহাদেবের পূজা, ধুনিঘরে পঞ্চমুন্ডি আসন প্রতিষ্ঠা করেন। মাঠা পাহাড়ে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদলা গ্রামের শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রতিষ্ঠা করেন। বদরী আশ্রম হয়ে ওঠে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব এবং তন্ত্রের সাধন ভুমি।

ভক্তবাবা ভিড় পছন্দ করতেন না। ছিলেন প্রচার বিমুখ। নিজেকে গোপন রাখতেন। যাকে প্রয়োজন তাকেই ধরাদিতেন এবং কাছে টেনে নিতেন। যে যেমন তৈরী তার কাছে ততটুকুই প্রকাশ করতেন। একশত আট (১০৮) বছর শরীরে থেকে শরীর ছেড়ে দেন। দেহ ত্যাগের পরেও যে সব ভক্ত জানতেন না, তাদের দিনের বেলা দেখা দিয়েছেন, তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এইভাবে বহুদিন দর্শন দিয়েছেন কিন্তু জানাজানি হবারপর আর দর্শন দেননি।

ভক্তবাবার দেহ ত্যাগের পর দেউল ঘাটায় ছিলেন জানতে পেরে আমি দেউল ঘাটায় গিয়ে আচার্য্য সুনীতি পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করি। ভক্তবাবা যখন দেউলঘাটায় ছিলেন সুনীতি পাঠক তখন যুবক। ভক্তবাবার কাছে প্রায়ই যেতেন। ভক্তবাবা ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ধ্রুবতারা অর্থাৎ দিক নির্ণায়ক, পথপ্রদর্শক, ও প্রেরনা, এককথায় প্রথম গুরু। সুনীতি পাঠকের কথায় বারবার ভক্তবাবার উপদেশ ধ্বনিত হতে শুনেছি। তাঁর কথায় এই তপঃসিদ্ধ তপস্বীকে আমি দর্শন করেছি। কথা বলেছি এমন কি পদসেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাঁরই প্রেরনা এবং সহযোগিতায় যেখানে ভক্তবাবা নবরাত্রিতে ৯ দিন ব্যাপি জয় রাধে গোবিন্দ নাম যজ্ঞ করেছেন সেখানে আমরা গোবিন্দ মন্দির করেছি। মন্দিরের গায়ে পাঠকজীর নির্দেশে একটা শিলা লিপি বসান হয়, কারন পাঠকজী বললেন - আমি চলেগেলে ভক্তবাবাকে বোঝার মতো আর কেউ এখানে থাকবে না বা মর্যাদা দেবে না। পাঠকজী বলেছেন আমি জানি অষ্টসিদ্ধি ভক্তবাবার করতলগত ছিল। তিনি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর ছিলেন। পরহিতার্থে কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়লে তা সামলে নিয়ে গোবিন্দ নামের মাহাত্মের কথা ভক্তবাবা বলতেন। তিনি সব সময়ই বলতেন, "**দেখিও বাবারা, ঐ অমূল্য নাম যেন শৌচ প্রস্রাবেও ভুল না হয়, উহা যেন একমাত্র সাথী থাকে সর্ব্বক্ষনের জন্য।**" বদরী আশ্রমে পাঠকজী ভক্তবাবার আর্বিভাব উৎসবে এসেছেন। মায়ের মন্দিরের সামনে বসে আছেন, হঠাৎ বাবা বাবা করে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। একটু সুস্থ হলে পরে বললেন-ভক্তবাবা ধুনিঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, "সুনীতি এসেছ, প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই আমি উপস্থিত থাকি।" এই ভাবেই ভক্তবাবা, কামরাজ বাবা, বাবাজী মহারাজ আমাদের মাথার উপরে থেকে বদরী আশ্রম চালান। পুরোপুরি আকাশ বৃত্তির উপর এই আশ্রম চলে।